তারিখ ... 29 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচন যেন কোন শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল!

জাত নিমের পাতা

মাহবুব কামাল

তুলনাটা প্রথম যিনি করেন, তিনি মানের ক্ষেত্রে, নাকি অন্য কোনো কারণে করেছিলেন, তা জানার দরকার নেই; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি অন্তঃসারশূন্য উপমা চালু রয়েছে যে, এটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচ্যে অবস্থিত সত্য; কিন্তু এটি অক্সফোর্ড হলো কী করে! ভাগ্যিস, অক্সফোর্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম আমি, তা না হলে ভাবতাম— হলেও হতে পারে। তা-ই বা কেন ভাববো? সবকিছুই চাক্ষুষ দেখতে হয় নাকি? আমি তো আইনস্টাইনকে দেখিনি, তাই বলে কি এ দেশের কিংবা ভারতের কোনো বিজ্ঞানীকে প্রাচ্যের আইনস্টাইন বলবো? পৃথিবীর সেরা চারটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছি আমি— ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এবং আমেরিকার বস্টনের হার্ভার্ড ও এমআইটি। ইংল্যান্ড ঘুরে এসে সাপ্তাহিক চলতিপত্রে অক্সফোর্ড নিয়ে যে কলামটি লিখেছিলাম, তার শিরোনাম ছিল— আধুনিক সভ্যতার উৎসমুখ। কেম্ব্রিজের লেখাটার শিরোনাম ছিল— কবি ও বিজ্ঞানীর ভিটেমাটি। নয় তো কী! ডারউইন, নিউটন, কীটস, শেলী, বায়রনসহ অসংখ্য বিজ্ঞানী ও কবির জন্ম দিয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে হার্ভার্ড সাহেবের একটি প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটির একটি পা ধরে থেকে গাইড নাসিম ভাইকে বলেছিলাম— এবার একটা ছবি তুলুন। আর এমআইটি? ১৯৯৯ সালে এর ক্যাম্পাসে যখন ঢুকছি, নাসিম ভাই বললেন— বলেন তো কোথায় এলাম? বললাম— জানি না। তিনি সুন্দর করে বললেন— কাজ হয় এখানে, ঠ্যালা বুঝে সাদ্দাম।

বাঙালির স্বভাবই বোধহয় এমন যে, সে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ছাড়া কথা বলতে পারে না। এটা কী? এটা এশিয়ার বৃহত্তম। ওটা? ওটা পৃথিবীর সেরা। উনি কে? ওনার মতো আর একটা মানুষও নেই। ইনি? এমন বাজে লোক আর হয় না। এভাবে যারা কথা বলেন, তাদের বলতেই হয়— তুমি এই ভেবে গর্ব করো না যে, তুমি মেয়েদের চিনেছো, কারণ আরেকটি মেয়ে তোমাকে আরও বেশি দুঃখ দিতে পারে। প্রাচ্যের দেশগুলোর কোনোটায় অক্সফোর্ডের সঙ্গে তুলনীয় সত্যি সত্যি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি-না, তা বোঝার চেষ্টা না করে হ্যাঁচকা টানে বলে দিলাম— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড! অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড না হোক, ডাকসু যে একসময় এ দেশের সেকেন্ড পার্লামেন্ট হিসেবে খ্যাত ছিল, সে কথায় সারবত্তা আছে। '৬৯ ও '৭০-এ তো পার্লামেন্ট বলে কিছু ছিলই না; বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত কেউ ছিলেন না বলে ডাকসুই তখন প্রকৃতপক্ষে বাঙালি সমাজে প্রথম পার্লামেন্টের মর্যাদা পেয়েছিল। ওই দুই পার্লামেন্টে লিডার অফ দ্য হাউজ ছিলেন যথাক্রমে তোফায়েল আহমেদ ও আসম রব। স্বাধীন বাংলাদেশে জিয়া ও এরশাদের আমল মিলিয়ে পাঁচবার যেসব ডাকসু গঠিত হয়েছিল (বঙ্গবন্ধুর আমলে একবার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ক্ষমতাসীনরা ফল প্রকাশ করতে দেয়নি), সেগুলো যথার্থই সেকেন্ড পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করেছিল।

অবশ্য অনেকে বলেন, ডাকসু নয়, মিডিয়াই প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট। তাদের মতে, মিডিয়া এমন এক পার্লামেন্ট, যার সেশন কখনও মুলতবি হয় না, অর্থাৎ ইট ইজ অলওয়েজ ইন সেশন। সত্যিই তো, পার্লামেন্টের নির্ধারিত সেশনগুলোয়ই কেবল জনগণের সমস্যা-সংকট, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আলোচিত হয় আর মিডিয়া প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে করে যাচ্ছে এ কাজ। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন তারা প্রথমে এমপির বদলে ছুটে যান মিডিয়াকর্মীর কাছে। প্রথম কারণ। মিডিয়াকর্মীকে যতো সহজে কাছে পাওয়া যায়, এমপিকে সেভাবে রিচ করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, তারা মনে করেন এমপিকে সমস্যার কথা বলে লাভ নেই, পত্রিকায় খবরটি ছাপা হলেই বরং তার টনক নড়তে পারে। যাক এসব কথা। আজকের প্রসঙ্গ ডাকসু নির্বাচন।

২

গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তিটা বোধহয় এমন যে, সমাজের সবাই যদি একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, তাহলে কিছুই অর্জিত হবে না; তাই প্রতিনিধি অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ঠিক করতে হবে। তো এই কর্তৃপক্ষ ঠিক করবে কে বা কারা? জ্ঞানী-গুণীরা? সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি ঘটার আশংকা রয়েছে। আবার সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধ রয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত হলো, জাজমেন্টটা আসতে হবে সম্মিলিত

বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের প্রয়োগ ঘটিয়েই। উদ্ভাবিত হলো নির্বাচন পদ্ধতি।

ছাত্রসমাজ দেশের একটি বড় অংশ। উপরন্তু ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ হাইলি পলিটিসাইজড একটি শ্রেণী। এখন, ছাত্রসমাজের আকার যেহেতু বড়, তাদের সমস্যা-সংকটও তাই ছোট নয়। ছাত্রদের সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করা এবং পলিটিসাইজড শ্রেণী হিসেবে তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বার্থেই ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন তাই অত্যাবশ্যক। অথচ দুই সামরিক শাসনামলে ডাকসু ও অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও '৯০-পরবর্তী কথিত গণতান্ত্রিক শাসনামলগুলোয় প্রক্রিয়াটি বন্ধ রাখা হয়েছে। জিয়াকে আমরা স্বৈরাচার বলি, একটা লোক কেন এতো জনপ্রিয় হলো, তা ভেবে দেখি না। অথবা 'পরিত্যক্ত' এরশাদ এই বৃদ্ধ বয়সেও রাজনীতিতে কেন ফ্যাক্টর, সেটাও তলিয়ে দেখি না। পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ স্বৈরাচার পতনের পর ফিনিক্স পাখির মতো ছাইভস্ম থেকে আবারও জেগে উঠেছে? এ দেশে শুধু ক্ষমতাটা নিতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে, তারপর সবকিছুই জায়েজ। জিয়া ও এরশাদ তা পারেননি বলে আওয়ামী লীগ-বিএনপির চোখে তাদের দোষের শেষ নেই। মনে পড়ে, '৭৯-'৮০-'৮১ সালের ডাকসু নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, জিয়া সেজন্য তার ছাত্রদলকে বশে রেখেছিলেন। এই তিন নির্বাচনেই ডাকসুতে অধিষ্ঠিত ভিন্ন মতাবলম্বীদের তিনি সম্মান দিয়েছিলেন যথেষ্ট।

হ্যাঁ, সব নির্বাচনই তো হচ্ছে দুমদাম— সংসদ, স্থানীয় সরকার, এফবিসিসিআই ও বার কাউন্সিলসহ সব পেশাজীবী সংগঠন, এমনকি স্কুলের গভর্নিং বডির নির্বাচনও। ডাকসুতে হচ্ছে না কেন? আমি আপাতত দুটি কারণ খুঁজে পেয়েছি। এক. ডাকসুর ইতিহাস বলছে, কোনো সময়ই এ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীনসমর্থিত প্যানেল জয়ী হতে পারেনি। '৯০-পরবর্তী সরকারগুলো তাই ভীত থেকেছে ও থাকছে এই ভেবে যে, ডাকসুতে বিরোধীদলসমর্থিতরা ভিপি-জিএস নির্বাচিত হলে বিরোধীদলের আন্দোলনে বিপজ্জনক মাত্রা যুক্ত হবে। তোফায়েল, আমানউল্লাহ আমান কিংবা মান্নার মতো ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় হাত দেয়া চলে না তাই। দুই. ডাকসু নির্বাচনের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টিই হয়তো নেই শাসক শ্রেণীর। 'হয়তো' বলছি কেন, বহির্দৃষ্টিই নেই যাদের, তাদের আবার অন্তর্দৃষ্টি! তাই ক্ষমতাসীনদের চোখের ছানি ও মাথার কনজেশন দূর করতে ডাকসু নির্বাচনের অপরিহার্যতা নিয়ে এখন কিছু কথা বলা যাক।

প্রথমত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য একটি বৈধ ছাত্র-কর্তৃপক্ষ নেই বলে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে কিছু আদায় করার বার্গেইনিং বডিও নেই। ডাকসুই হতে পারে সেই বার্গেইনিং বডি।

দ্বিতীয়ত, ডাকসু ভবিষ্যৎ রাজনীতিক উপহার দেয়ার এক বড় সাপ্লাই লাইন। স্বাধীনতার আগে-পরে যারা ডাকসুর বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে মন্ত্রী-এমপি হয়েছেন। যারা হননি বা হতে পারেননি, তারাও রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহমুদুর রহমান মান্না যেমন। রাজনীতির ক্যারিয়ার ছাড়াই হঠাৎ করে রাজনীতিক বনে যাওয়ার যে পলিটিক্যাল কালচার তৈরি হয়েছে দেশে, ডাকসু তার অনেকটাই প্রতিবিধান করতে পারে।

তৃতীয়ত, জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন-গ্রাম পর্যায়ের যেসব ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়, তারা শিক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে উন্নত মননশীলতা গড়ে তোলার একটি ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে। বলাই বাহুল্য, একটি রাজনৈতিক মানস ছাড়া একজন মানুষ পরিপূর্ণ আধুনিক হতে পারে না। রাজনৈতিক মানস মানুষকে যে কোনো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর মুখে সিদ্ধান্ত নিতে পারদর্শী করে তোলে। ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মানসিক উৎকর্ষ ও একটি পলিটিক্যাল মাইন্ড গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

চতুর্থত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যে মাঝেমাঝেই অশান্ত হয়ে ওঠে, ছাত্রদের মধ্যে যে উন্মত্ততা দেখা দেয়, তার একটি মনোবৈজ্ঞানিক কারণ আছে। অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে বসবাস করলে অনুকূল পরিবেশে তাদের মধ্যে গণউন্মত্ততা (mass insanity) দেখা দিতে পারে। এ কারণে গত শতাব্দীর ষাটের দশকে অ্যাংরি ইয়াংম্যান আন্দোলনের সময় সেখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ডরমেটরির আকার ছোট করে ফেলা হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের হলভিত্তিক যে সংঘবদ্ধ জীবন, তা ক্যাম্পাসের সহিংসতা-সংঘর্ষের অন্যতম বড় কারণ। ছাত্রসমাজের উন্মত্ততা ও সহিংসতা বশে রাখার ক্ষেত্রে ডাকসুর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

পঞ্চমত, ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে জীবন্ত (lively) করে তুলতে পারে। '৭৯-এর ডাকসু নির্বাচনের সময় ছাত্রসমাজের উৎসবমুখর মেজাজ, ভোট-পরবর্তী অভিষেক এবং ডাকসু কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তি চর্চার অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্টদের মনে প্রথম প্রেমের প্রথম ভালো লাগার স্মৃতির মতোই সব সময় টাটকা বলে অনুমান করি।

শাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্দৃষ্টি খুললো কি? জানি খোলেনি।

পুনশ্চ: অক্সফোর্ডের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাটা একটু দেখা যাক। নেহায়েতই প্র্যাক্টিক্যাল জোকস। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যেন কিছু মনে না করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসংলগ্ন শরীফ মিয়ার বিখ্যাত সেই ক্যান্টিনে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুমুল তত্ত্বকথা ও চা-সিগ্রেট চলতো। তো একদিন সেখানে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র কী একটা বিষয়ে তর্ক করছিল। তর্কে কেউ হারতে চাচ্ছে না। শরীফ মিয়া এক পর্যায়ে তার সহকারী রমজান ভাইকে উদ্দেশ করে বললেন— বুঝছোস রমজান, আমার এহানে (এখানে) যে চল্লিশ কাপ চা খাইছে, হে (সে) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পাশের চাইয়া (চেয়ে) বেশি জানে।

শরীফ মিয়া ও রমজান ভাই এখন বেঁচে আছেন কি-না জানি না। খুব মনে পড়ে তাদের। '৭৫-'৭৭ সালে তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা যখন চরম অর্থনৈতিক মন্দার শিকার, উদভ্রান্তের মতো চলাফেরা, ভাত খাওয়ার জন্য লাগে এক টাকা তো আছে চারআনা, সেই সময়টায় শরীফ মিয়া রমজান ভাইকে একদিন বলেছিলেন— রমজান, কবিরা এহন ঘোড়া হইছে, হেরা ভাত খায় না, ছোলা খায়।

মাহবুব কামাল : সাংবাদিক
mahbubkamal08@yahoo.com